সত্যি ভ্রমণ কাহিনী : সাধারণ পাঠকের চোখে

প্রসেনজিৎ ঘোষ

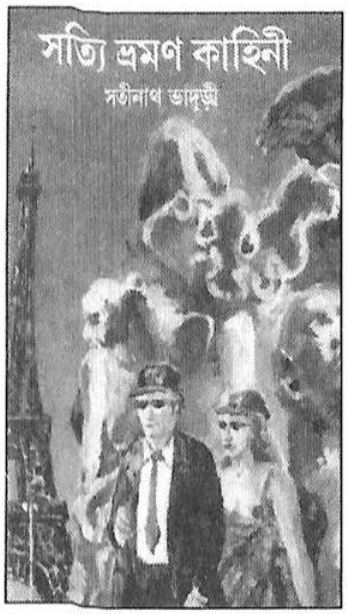

সত্যি ভ্রমণ কাহিনী
সতীনাথ ভাদুড়ী
প্রথম সংস্করণ : আশ্বিন ১৩৫৮
চতুর্থ মুদ্রণ : মাঘ ১৪১০
প্রচ্ছদ পট : শ্রী সঞ্জীব দেয়াসী
প্রকাশ ভবন ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০০৭৩
একশো চল্লিশ টাকা

সত্যি ভ্রমণ কাহিনী বইটি লেখক সতীনাথ ভাদুড়ীর পরিণত বয়সের লেখা (১৯৫১)। আগেই প্রকাশ পেয়েছে *জাগরী* (১৯৪৫), *গণনায়ক* (১৯৪৮), *ঢোঁড়াই চরিতমানস* (প্রথম চরণ) ও *চিত্রগুপ্তের ফাইল* (১৯৪৯)। ১৯৪৯-৫০-এর মধ্যে দীর্ঘ সাত মাস সময় ধরে সতীনাথ ইংল্যান্ড হয়ে প্যারিস ও প্যারিসকে কেন্দ্র করে ইউরোপ মহাদেশের অন্য কয়েকটি দেশও ভ্রমণ করেন। *সত্যি ভ্রমণ কাহিনী* সেই ভ্রমণকালের কাহিনি। একজন লেখকের Personal Narrative-এ বইটি লেখা। 'আমি' উল্লেখ নেই। ষোলোটি অধ্যায়ের গ্রন্থটির প্রথম পনেরোটির সঙ্গে আবার 'ডায়েরি' শিরোনামে লেখা সংযোজিত। লেখকের নিজের কথায়—

> ফরাসী লেখকরা সকলেই নিয়মিত জুর্ণাল (ডায়েরি) লেখেন। এই ডায়েরিগুলোর এদেশে কদর খুব। রোমে এসে রোমানদের মতোই হওয়া উচিত... এর আগে বহুবার লেখক নববর্ষের দিন নিয়মিত ডায়েরি রাখবার প্রতিজ্ঞা করেছে; কিন্তু প্রতিবার দিনকয়েক পরই তার উৎসাহ উবে গিয়েছে। অনেক ধরনের অনেকগুলো মনের সমষ্টি একটা মানুষ। কেবল নিজের জন্য লেখা ডায়েরিতেও, নিজের সব মন কয়টির কথা লেখা যায় না কাগজে কলমে। তাই চিরকাল মনে হয়েছে যে, এ পরিশ্রম নিরর্থক; কিন্তু এবারকার ডায়েরিটা হবে পরের জন্য লেখা। এর আবার একটা অর্থকরী উদ্দেশ্যেও আছে। কাজেই বোধ হয় শেষ পর্যন্ত উৎসাহটা মিইয়ে যাবে না।

এর অর্থ হল এই লেখা ফরমায়েশি এবং ডায়েরিটা হয়েছে পরের জন্য লেখা। স্বাভাবিকভাবেই ভ্রমণবৃত্তান্ত এই গ্রন্থে মিশেছে দিনলিপির সঙ্গে। যে বৃত্তান্তে বর্ণিত আছে লেখকের সঙ্গে 'অ্যানি' নামের একজন মহিলার সম্পর্কের কাহিনি।

'লিখতে তার ভালো লাগে না। তবু সে হয়ে পড়েছিল একজন লেখক দশচক্রে পড়ে।' প্রথম দুটি লাইন এই কাহিনির। তারপর—

> বড়ো লেখক যে সে কোনোদিন হতে পারবে না তা সে জানে; কেননা খুঁটিনাটির ওপর তার এত ঝোঁক যে আসল জিনিসই যায় কলম এড়িয়ে। ভালো লাগে তার পড়তে, কিন্তু পড়া জিনিসটাকে হজম করার মতো ক্ষমতা আর ধৈর্য তার নেই।

বেশ লাগে পড়তে। কারণ এই *সত্যি ভ্রমণ কাহিনী* লেখার আগে অনেক বড়ো সত্যি হিসাবে *জাগরী* আর *ঢোঁড়াই চরিতমানস*-এর মতো গ্রন্থগুলি তখনই প্রকাশিত এবং প্যারিসে ভ্রমণকালেই সতীনাথ দেশের প্রথম 'রবীন্দ্র পুরস্কার'-এর জন্য মনোনীত হন। তদুপরি, কাহিনি এগোলে লেখকের ভাষ্যেই অ্যানিকে বলছেন, 'হাঁ তা লিখতে পারি বৈকি। এর চাইতেও কত মোটা বই লিখেছি।' ... গুছিয়ে লেখা শুরু করবার কি অনবদ্য টেকনিক। পাঠকের চোখে পড়বে ভেবেই লেখা।

পুরো প্রথম অধ্যায় জুড়েই রয়েছে লেখকের নিজেকে প্রকাশ; কেন অন্য কোনো দেশ নয়; 'তার প্যারিস বাছবার প্রত্যক্ষ আর পরোক্ষ কারণ' ইত্যাদি। লেখকের একদম নিজের ভাবনাগুলো পাঠকদেরও ভাবায়, ভাবতে বাধ্য করে। 'এতদিনের একটা সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও ইংরাজ আমাদের বোঝে না, আমরাও ইংরাজদের বুঝি না। ফরাসীরা কিন্তু আমাদের চেনা মানুষ। স্বাভাবিক বলেই তারা এত সুন্দর।'— মনের নৈর্ব্যক্তিক দ্বন্দ্বগুলোর সরল ও যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা রইল টীকা-টিপ্পনী আর তীক্ষ্ণ, সূক্ষ্ম ও মিঠে-কড়া রসিকতায় ভরা।

> ঋতুর পরিবর্তনের মতো, মনের পরিবর্তনটাও সময় নেয়। প্রথমে সে মনে করেছিল, তার চল্লিশ বছরের জীবনের অভিজ্ঞতার ফল এগুলো। তারপর সে একদিন তার অতি পরিচিত মনটাকে চিনতেই পারে না;— মানুষের ওপর বিশ্বাস কমছে; মানুষ কেন, বিশ্বাসের কোনো জিনিস খুঁজে পায় না পৃথিবীতে, সব জিনিসে ভালোর চেয়ে মন্দটাই বেশি চোখে পড়ে। ... একটা জিনিস দেখেই প্রথমে যে ধারণাটা হয়, তার বিরুদ্ধে তার মন প্রশ্ন তোলে।

এ তাঁর নিজের কথা। আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

সত্যি ভ্রমণ কাহিনী পড়া শুরু করলে, বার বার যেকোনো পাঠকেরই মনে হবে— কাহিনি বলার বা নিরীক্ষণ বিধৃত করবার এ এক অনবদ্য টেকনিক। যে প্রেক্ষাপটটিকে গৌরবান্বিত করবার চেষ্টা থাকবে, তাকে কীভাবে পাঠকের চিন্তায়, মননে ও চেতনে প্রবেশ করানো যায়। কেন প্যারিস? পৃথিবীতে এত জায়গা থাকতে তিনি প্যারিসকে কেন্দ্র করে কেন বেড়াতে চান, লেখার প্রতি পরতে তারই অকাট্য যুক্তি সাজানো। ইংল্যান্ড হয়ে তিনি গিয়েছিলেন প্যারিসে।

> ... ইংরাজের মনটা বেনের, আর ফারসী মনটা কবির। ... বহু জিনিস মিলিয়ে তার ফরাসী দেশের উপর টান। রুশের নূতন সভ্যতার নূতন মানুষ দেখবার ইচ্ছাও তার খুব। ... প্যারিস থেকেই রুশের ভিসা যোগাড় করা সহজ, কারণ মস্কোর বাইরে নিজের দেশটাকে বলে 'ইউরোপের সিংহদ্বার'। সে ঠিক করে যে প্যারিসকে হেড কোয়ার্টার করেই সে সারা ইউরোপ দেখবে। এক কেবল জার্মানীতে সে যেতে চায় না। ঐ আজ্ঞানুবর্তিতার দাস দেশটার উপর তার শ্রদ্ধা গিয়েছে, যবে থেকে তারা আইনস্টাইনকে দেশছাড়া করিয়েছে। ... অতি সাধারণ ভ্যাগাবণ্ড গোছের লোক সে; এসেছে বেড়াতে, অর্থাৎ কিনা ফরাসী সংস্কৃতিকে তার শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করতে।

লেখক বড়োলোক নয়। টাকার কথা না ভেবে উপায় নেই তাঁর। যেহেতু লেখক প্রথমে প্যারিসে উঠলেন সস্তার হোটেল 'ফুলের হোটেল'-এ। হোটেলওয়ালি 'প্যাত্রোন'-এর স্প্যানিশ স্বামী স্পেন আর মরক্কোতেই থাকেন বেশি। তাই মহিলার অন্তরঙ্গতা কিছু বেশি ভারতীয় গান্ধীর সঙ্গে।

> পাড়াগেঁয়েকে কলকাতা দেখানর মতো মুরুব্বিয়ানা ভাব গান্ধীর। ...কত দরকারি জিনিস গান্ধী লেখককে লেখায়। ... কোথায় থাকে, কি করে কে জানে! ...তবে বেশ ছেলে গান্ধী। ইংরাজী, ফরাসী, স্প্যানিশ, তিনটে ভাষাতেই অনায়াসে কথা বলতে পারে। ... গান্ধীর অভিভাবকত্বে লেখকের দিন কেটে যাচ্ছিল মন্দ না। ... ফ্রান্সে তার থাকবার অনুমতি ছিল তিন মাসের। ... আইনসঙ্গতভাবে তিন মাসের উপর থাকতে গেলে পুলিসের কাছে প্রমাণ দিতে হয় যে, তুমি এখানে পড়াশুনা করছ, রোগের চিকিৎসা করাচ্ছ, না হয় ঐ জাতীয় কোনো একটা উদ্দেশ্যে আছ। সেইজন্য লেখক অনেকগুলো স্থানীয় শিক্ষায়তনে ভর্তি হয়ে যায়। আবিষ্কারের আনন্দ নিয়ে প্যারিসের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়।

পুলিশের ঝামেলা এড়াতে গান্ধী একদিন চলে গেল জেনিভাতে। লেখককেও কিছু ঝামেলা পোহাতে হল। সবশেষে 'লেখক' হবার সুবাদে নিষ্কৃতি। সুতরাং 'হোটেল বদলাবার চিন্তা তার মাথায়।'

অনেক ঘোরাঘুরির পর Renault মোটর কারখানার পাড়ায় একটা হোটেলে ঘর নিলেন লেখক। 'চুরাশিটা ঘর আছে এই হোটেলে। তিন ঘণ্টার জন্য ঘর ভাড়া পাওয়া যায় সেরকম দুর্নামওয়ালা বাড়ি এটা নয়।'... এপাড়ার 'অধিকাংশ লোকই ঐ কারখানার সঙ্গে কোনো না কোনো রকমে সংশ্লিষ্ট। লেখক ভাবে যে, এ হল তার শাপে বর; এ পাড়ায় থাকলে এদেশের মজুরদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় করবার সুযোগ পাবে।' এই হোটেলেই আলাপ লেখকের সঙ্গে অ্যানির।

> নতুন মেড, নতুন ভাড়াটে, নতুন মালিক। ... খুব কথা বলতে ভালোবাসে অ্যানি— বিশেষ করে 'ও লালা!' বলতে। ...বেশ চটপটে। কালো চোখ, ছুঁচলো নাক, চুলগুলো স্কার্ফ দিয়ে বাঁধা, গায়ে কাজের এপ্রন, পায়ে কম্বলের জুতো। পায়ের গোছা কি মোটা! এর কথা আশ্চর্য রকমের স্পষ্ট, আর বলেও খুব আস্তে আস্তে।

ছোটো নাম লেখকের খুব পছন্দ।

'হিন্দুরা খুব স্নান করে'— এই সূত্রে লেখকের সঙ্গে আলাপ স্নানের দোকানের মার্গট-এর সঙ্গে; আবার মার্গট-এর সূত্রে বাঙালি 'দেবরায়'-এর সঙ্গে। 'মধ্যে মধ্যে সে বেড়িয়ে আসে প্যারিসের বাইরে। গ্রামাঞ্চলেই যায় বেশি। সে চায় সাধারণ মানুষকে জানতে।' একদিন লেখক বেলা অবধি বিছানায়। 'একগোছা ঝরা চেস্টনাটের পাতা নিয়ে ঘরে ঢোকে অ্যানি। ...শুকনো ঝরা পাতা থেকে সৌন্দর্য নিংড়ে নিতে ফরাসীরা ছাড়া আর কোনো জাত পারবে না।' অ্যানি লেখকের বয়স জানতে চাইলে— 'এক বছর কমিয়ে সে নিজের বয়স বলে।' আর ভাবে আরও দু-বছর কমিয়ে বলা যেত। লেখকের চায়ের সমস্যাটা অ্যানির চিন্তার বিষয় হয়ে উঠলে সে লেখকের জন্য নিয়ে আসে একটা স্পিরিট স্টোভ— যেটা জার্মানীতে তৈরি, আর যেহেতু ফরাসি দেশে তৈরি নয়, 'জিনিসটা ভালো' অ্যানির মতে। লেখক ভাবেন, 'এত জার্মানীর উপর বিদ্বেষ। তবু ফরাসীরা জার্মান জিনিস কিনতে দ্বিধা করে না' লেখক অ্যানিকে জিজ্ঞাসা করেন, জার্মানরা যখন ফ্রান্স দখল করেছিল, তখন ফরাসিদের উপর কোনো অত্যাচার করেছিল কি না; কিংবা জার্মানরা ফ্রান্সে ইহুদিদের কী চোখে দেখত। উত্তরে অ্যানি জানিয়েছিল— 'আমি কি রাজনীতি যে অত কথার জবাব জানব?'

কারণে, অকারণে 'হাসতে হাসতে অ্যানির দমবন্ধ হয়ে আসে। ...এই প্রাণখোলা হাসিটা লেখকের খুব ভালো লাগে। হাসি তো নয়, তার সময়োপযোগী কথা বলবার ক্ষমতার প্রতি প্রশংসাঞ্জলি।' কিন্তু 'লেখকের চায়ের খরচের কথাটাই তখনও অ্যানির মাথার মধ্যে ঘুরছে'। লেখক কিছুদিনের জন্য চলে যান হল্যান্ড, বেলজিয়ম, সুইট্জারল্যান্ড ও ইটালি দেখে আসতে। হোটেলে ঘর বুক করে রেখে বেড়াতে যাওয়ার জন্য অকারণ অতিরিক্ত খরচ নিয়ে অ্যানির 'ও লালা!' কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ হল। দৃশ্যত লেখকের ওপর অভিমান এইজন্য যে— 'যদি অ্যানিকে রাখতে দিতেন লেখক, তাহলে সে অনায়াসে জিনিসগুলোকে হোটেলের গুদামে রেখে দিতে পারত।' বিদেশ বিভুঁয়ে অপ্রত্যাশিত দরদের সন্ধান পেয়ে বড়ো ভালো লাগে লেখকের। 'প্যারিস ছাড়বার সময় লেখকের ভালো লাগছিল না।'

> বেড়ানোর সময় অ্যানির কথা মনে পড়েছে যখন-তখন; লেবুর রস দেওয়া চায়ে চুমুক দেওয়ার সময়, চেস্টনাটের ঝরা পাতা দেখে। হোটেলের মেড দেখলেই মনে মনে তার সঙ্গে অ্যানির তুলনা আপনা থেকে এসে যায় ...

ওই দেশে ভ্রাম্যমাণ পরিচিত লোকের কাছ থেকে সকলে আশা করে ছবিওয়ালা পোস্টকার্ড পাবার। ...অ্যানির বাসার ঠিকানা জানে না; সেইজন্য Hotel de Paris-এর ঠিকানাতেই চিঠি দিতে হয়। প্রথমে লেখে হোটেলওয়ালির নাম (যেহেতু চিঠি গিয়ে পড়বে হোটেলওয়ালির হাতে), তারপর দেবরায়... সবচেয়ে শেষে লেখে অ্যানির নাম।

> সুইট্জারল্যাণ্ড থেকে সে শেষ চিঠি দিয়েছিল সকলের কাছে ...যে সে বিষ্যুৎবারে বেলা তিনটের গাড়িতে প্যারিসে ফিরবে ... তার নিভৃততম মন জানত যে অ্যানি আসবেই। ...

> কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ না থাকলেও সে আশা করেছিল যে, অ্যানি নিশ্চয়ই তাকে স্টেশনে নিতে আসবে। সেই জন্যই সে অ্যানির সাপ্তাহিক ছুটির দিন বৃহস্পতিবারে ফিরবার দিন ঠিক করেছিল।

কিন্তু স্টেশনে তাঁকে নিতে এল দেবরায়। সে লোক ভালো বলেই হোক, কিংবা সুইট্‌জারল্যান্ড থেকে তার জন্য লেখকের নিয়ে আসা জীবাণুনাশকের শিশির জন্যেই হোক, 'দেবরায়কে চিনতে বিশেষ দেরি লাগে না। ...তিনদিনের মধ্যে লেখক জেনে গেল, তাঁর গল্প কোন কথা দিয়ে আরম্ভ হয়, আর কোথায় তার পরিণতি।'

> লেখক ইচ্ছে করেই গত কিছুদিন অ্যানিকে এড়িয়ে চলেছে। অ্যানির যদি, তার কথা মনে না পড়ে, তবে তারই বা কি দায় পড়েছে অ্যানির কথা ভাববার।

যদিও

> অ্যানির তো স্টেশনে আসবার কোনো কথা ছিল না। তবে সে না এসে অন্যায় করল কি করে? ... অ্যানির উপর অভিমান করবার সত্যিকার অধিকারটুকু জন্মালেও লেখক স্বস্তি পেত। ... অ্যানির ঘরঝাঁট দিতে আসবার সময় হলে... আপোষের জন্য উন্মুখ মন লজ্জায়, কুণ্ঠায়, সাক্ষাতের পূর্ব মুহূর্তে দিশেহারা হয়ে পড়ে।

হোটেলওয়ালির সঙ্গে কথা বলার সময়, অ্যানি যে বয়সের দিক থেকে কচিখুকি নয়— এমন আলোচনা লেখককে অপ্রস্তুত করে। অ্যানিকে দিয়ে হোটেলওয়ালি বেশি কাজ করান— এ অন্যায় বলে মনে হয়। অ্যানি অনুযোগ করে লেখকের কাছে : 'লেখকের মোজা ছেঁড়ে গোড়ালির কাছে, আমার ছেঁড়ে হাঁটুর কাছে। যত শক্ত মোজাই কেনো, হাঁটু গেড়ে কাঠের মেঝে আর সিঁড়ি ঘষে ঘষে, পরিষ্কার করতে হলে পনের দিনের বেশি টিকতেই পারে না।' বেশ মোটা তার পায়ের গোছা, তবু লেখক বলেছিল— 'এ পা কি আর সিঁড়িতে হাঁটু গেড়ে বসবার? এ পা নাচবার। অ্যানির সঙ্গে একটা মিটমাট করে নিয়ে লেখক হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে।' যেদিন লেখক বোঝেন যে আজ অ্যানির তাড়া নেই, 'অ্যানি সিগারেট বার করতেই লেখক তার সিগারেটটা ধরিয়ে দেয়।' লেখকের টেবিলে মোটা বই দেখে অ্যানি লেখকের পাণ্ডিত্যের প্রশংসা করে। লেখক বুক ফুলিয়ে জানান দেন যে এর চাইতেও মোটা বই তিনি লিখেছেন। অ্যানি শুনে অবাক হয়ে প্রশ্ন করে, 'আপনাদের গরম দেশে এত বেশি পড়াশুনো করলে মাথা ধরে না?' আবার বলে, 'আপনার বইয়ের মধ্যে, আমার কথাও খানিকটা লিখতে হবে কিন্তু।' আরও অনেক না ভেবে, না গুছিয়ে অ্যানির বলা কথা লেখককে আনন্দ দেয়। 'Reuille' (রিউই) পনির যে খুব ভালো তাও লেখক জানতে পারেন অ্যানির থেকে এবং বানান ঠিক করে নিতে লেখকের নোটবুকে অ্যানি কথাটা লিখে দেয়। লেখক মিথ্যে করে অ্যানিকে বলেন যে গত রবিবার 'অতুই'-এর রেসকোর্সে তিনি এক বান্ধবীর সঙ্গে গিয়েছিলেন। বান্ধবীর সম্বন্ধে নয়, অ্যানি ঘোড়দৌড়-এর বাজি আর জুয়ার কথাটা চালিয়ে যায়। 'ফরাসীদের জাতীয়

স্পোর্টস সাইকেল চালানো আর প্রেম প্রেম খেলা। ... বিয়ে, প্রণয়, আর ছেলেপিলে হওয়া, এগুলো ফরাসীমনের আলমারির আলাদা আলাদা খোপ...।' লেখকের মনে হয়।

রান্না দেখিয়ে দেবার ছুতো করে অ্যানি মাঝেমাঝেই আসে, রুম হিটার মেরামত করতে হোটেল মালিককে তাগাদা দেওয়ার জন্য লেখককে বলেন। লেখক অ্যানিকে দেখাতে চান মনে করে 'তার হাতের তেলো খুব নরম... অ্যানির হাতখানা নিজের মুঠোর মধ্যে নিয়ে। কিন্তু তার শক্ত কড়া পড়া হাত অন্যকে দিতে অ্যানির একটা সঙ্কোচ আছে।'

> আরও আছে এরকম বহু খুঁটিখাটি জিনিস। সব কথা কি বলা যায়? প্রেমের খেলার নিয়মের মধ্যে এগুলো। ভালোবাসায় সব ভুলিয়ে দেয়, কেবল অ্যানি আর এইগুলোকে ছাড়া। লেখক আজকাল বেশি করে নিজের আর অ্যানির মনটাকে বুঝে দেখবার চেষ্টা করে। ... অ্যানিকে সে সত্যিই ভালোবাসে। এর যুক্তিসঙ্গত পরিণতি দেশে ফিরবার সময় অ্যানিকে বিয়ে করে নিয়ে যাওয়া। ... দেশে তার বাড়ির লোকে কি বলবে, কি ভাববে, কেমনভাবে তারা অ্যানিকে নেবে।

এসব কথা না ভেবে লেখকের উপায় নেই। 'অ্যানিকে পেলে সে আর বাকি পৃথিবী ছাড়তে তৈরি আছে।'

'রুশে যাবার অনুমতি পেল না লেখক।' ...খবরটা পেয়ে অ্যানি—

> '...ও লালা!' বলে আনন্দে জড়িয়ে ধরেছিল লেখককে। ...গত বিশ বছর থেকে তার রুশে যাওয়া নিয়ে এত জল্পনাকল্পনা... লেখক নিজেই আশ্চর্য হয়, রুশে যেতে না পেরে তার যতটা দুঃখ হওয়া উচিত ছিল, ততটা হয়নি দেখে। ...অ্যানিকে ছেড়ে থাকবার কথা মনে করলেই তার মনটা খারাপ হয়ে যেত।

অ্যানিই বয়ে নিয়ে আসে লেখকের জন্য টেলিগ্রাম— 'সে পেয়েছে দেশের একটা সাহিত্যের পুরস্কার। খবর শুনে হাততালি দিয়ে, হেসে, চেঁচিয়ে, লেখককে জড়িয়ে ধরে, জুতো খটখট করে নেচে, বার কয়েক "ও লালা" বলে', তারপর 'লেখকের' হাত ধরে টানতে টানতে নীচে নিয়ে যায়, লেখকের 'লটারিতে টাকা পাবার এত বড়ো সুখবরটা মালিকানিকে দেবার জন্য'। সে ভেবেছে যে, 'লেখক অনেক টাকা পাবে...' তাই, 'কাফেতে বহুক্ষণ শ্যাম্পেন খেয়ে অ্যানি সে সন্ধ্যায় বেশ প্রগল্‌ভা হয়ে পড়েছিল।... গল্পে গল্পে কখন ঘোড়দৌড়ের কথা চলে এসেছে...' গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে অ্যানি তার ভাগ্যবান 'মুস্যিয়ো' লেখককে দিয়ে পয়া ঘোড়ার নাম বসিয়ে নেয়, পরের দিন রেসের মাঠে বাজি ধরবার জন্য। আর 'হাসতে হাসতে সে মুস্যিয়ো ভাগ্যবানের হাতখানা টেনে নিয়ে গালের উপর রাখে।' তাও বলি বলি করে যেকথা লেখকের বলা হয়নি অ্যানিকে এতকাল, সে প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে তোলার চেষ্টা করেন লেখক। কিন্তু অ্যানির অনাগ্রহে বলা হয়ে উঠল না।

> সে-রাত্রে লেখকের ভালো ঘুম হয় না। অ্যানির কথাই বার বার মনে পড়ে। ...আর এ বিষয় নিয়ে একদিনও দেরি যে করতে পারে না। ...কাল ঘোড়দৌড়ের মাঠেই সে যাবে।

শনি-রবিবারের চাইতে কম ভিড় সেদিন ঘোড়দৌড়ের মাঠে।

> তবু অ্যানিকে খুঁজে বার করতে অসুবিধায় পড়তে হয়েছিল। ...নতুন ধরনে চুল-বাঁধা, ফারকোচ পরা, হাতে দস্তানা— এ অ্যানি একেবারে অন্য মানুষ! সঙ্গে আবার একজন ভদ্রলোক বয়স ত্রিশ-বত্রিশ। ...অ্যানির কোমর জড়িয়ে ধরে চলেছে ভদ্রলোকটি! ... ভদ্রলোকটি অ্যানিকে কোলে তুলে ধরেছে, পিছন থেকে ও যাতে সে দেখতে পায়।

তারপরের দুইজনের ব্যবহার ঠিক বন্ধুর মতো নয়। ...সমস্ত রেসকোর্সটা মুছে যায় লেখকের চোখের সামনে থেকে।

'প্যারিসে হাঁফ ধরে গিয়েছে। সে প্যারিসের বাইরে যাবে। নেপ্‌ল্‌স-এর বিজ্ঞাপনটা হঠাৎ নজরে পড়েছিল।' তিনি পালিয়ে ছিলেন বেহায়া প্যারিসের অসখ্যতার হাত থেকে বাঁচবার জন্য। নেপ্‌ল্‌স, পম্পেই, বিসুভিয়াস, কাপ্রি দেখে লেখক মনস্থ করেন— 'স্বাভাবিকভাবেই যে অ্যানিকে বলবে তার জীবনের সঙ্গিনী হতে। প্যারিসে আর বেশি দেরি না করে, তাঁকে নিয়ে চলে যাবে দেশে।' এবারেও তিনি প্যারিসে ফিরলেন বৃহস্পতিবারে। যেদিন অ্যানির ছুটি। কয়েকদিন অনুপস্থিতির পর নিজের ঘরখানাকে আরও আপন মনে হয়। ঘরের সব জিনিসে অ্যানির দরদি হাতের পরশ। পরদিন সকালে— দরজায় আচমকা জোরে ধাক্কা দিয়ে ঢোকেন মাদাম প্যাত্রোন। পেছনে আর একজন ভদ্রলোক। মাদামের চোখ জলে ভরা। বললেন, 'আমাদের অ্যানির খবর শুনেছেন? তার ছেলেটি মারা গিয়েছে, তিন দিনের অসুখে। এই অ্যানির স্বামী মুস্যিয়ো লেভি। ... ছেলে! স্বামী! অ্যানির? ... একেই সেদিন ঘোড়দৌড়ের মাঠে দেখেছিল অ্যানির সঙ্গে।' মুস্যিয়ো লেভি কত কথাই বলে যান লেখককে। তারপর বলেন—

> বেলা চারটেতে সবুজ চিমণির গলির ইহুদী গোরস্তানে 'রাবি'র সার্মন হবে। ...আপনারা গেলে অ্যানি তবু কিছু সান্ত্বনা পাবে ... অ্যানিরা ইহুদী? একথা লেখক কোনোদিন কল্পনাও করতে পারেনি। ... অ্যানির আজকের ক্ষতির তুলনায় লেখকের ক্ষতি কতটুকু! ... ইহুদী গোরস্তানে সে অ্যানির দিকে তাকাতে পারে না। টুপির সঙ্গে কালো পাতলা নেটের ভেল দিয়ে তার মুখখানা ঢাকা। ... ইচ্ছা হয়, অ্যানি তার কোলের মধ্যে মাথা গুঁজে কাঁদুক, আর সে তার এলোচুলের মধ্যে আঙুল চালিয়ে দিয়ে দিয়ে তাকে সান্ত্বনা দিক।

অ্যানির স্বামী লেখককে একটা লিস্ট থেকে যে-কোনো একটা ফুলের গাছ বাছতে বলল— কবরের উপর পোঁতা হবে। লেখক বাছলেন একটি জবা জাতের ফুলের গাছ— জবা নামটার মধ্যে দিয়ে এর সঙ্গে লেখকের দেশের সঙ্গে একটা সম্পর্ক আছে। ...অ্যানি বৎসরান্তে এখানে চোখের জল ফেলতে এলে, আর একদিনের ফিকে স্মৃতির সুবাস হয়তো এখানে এসে পেতেও পারে। ... আর সকলের মতো লেখকও এক কোদাল মাটি দিলেন কবরের উপর। পরে সার্মনের সময় লেখক ভাবলেন ইহুদি যখন, তখন হিব্রু ভাষায় নিশ্চয়ই সার্মন পাঠ হল। ভুল ভাঙিয়ে মার্গট বলে :

> রাবি তো সার্মন দিলেন জার্মান ভাষায়... অ্যানির যত বন্ধুবান্ধব দেখছেন এখানে আমরা যে সব জার্মানীর ইহুদী। ১৯৩০-৩২ সালে সবাই চলে আসি সেখান থেকে। অ্যানিদের বাড়ি ফ্রাঙ্কফুর্টে। অ্যানির বিয়ের পরই— এই বছর দশ-বারো আগে— ওর বাবা চলে গিয়েছিল সাংহাই না কালকুত্তা কোথায় যেন চাকরি নিয়ে।

তাই কি অ্যানি ভারতবর্ষের আর চীনের খবর এত জানতে চাইত?

> গত কিছুক্ষণ থেকে লেখক চেষ্টা করছিল অ্যানির দিকে না তাকাবার। ...অ্যানি ফিরে তাকালো লেখকের দিকে। কালো জালের মধ্যে দিয়েও অ্যানির কালো চোখ দুটো দেখা যাচ্ছে। ... তাকানো আর যায় না সে চোখের দিকে। তার কথাটাও নিশ্চয়ই অ্যানি বুঝালো। ... নতুন করে আসা অশ্রুতে অ্যানির চাহনির ব্যঞ্জনা ঢাকা পড়েছে। ... অ্যানি বলেছিল জার্মানী যেতে... দুটো ফ্রাঙ্কফুর্ট আছে— একটা মেন নদীর উপর, একটা ওডার নদীর উপর।

জিজ্ঞাসা তো করা হল না মার্গটকে। টিউব স্টেশনের সিঁড়ি ধরে নামার সময় পশ্চিম জার্মানীর মিলিটারি অফিসের ঠিকানাটা টুকে রাখবার জন্য 'নোটবুক খুলতেই চোখে পড়ে পনীরের নাম "রিউই"— অ্যানির হাতের লেখা।— লেখকের দুর্জ্ঞেয় মনের চাবি।' একটি অতি সাধারণ মেয়ের কালির আঁচড়ে ধরা পড়েছে এক গ্রন্থকীট মনের নিবিড়তম উপলব্ধি। এই পাথেয় নিয়েই তিনি দেশে ফিরবেন। অ্যানির সঙ্গে জীবনটা জট পাকিয়ে গিয়েছে। জার্মান মিলিটারি অফিসের ঠিকানাটা ঝাপসা হয়ে এসেছে চোখের জলে।

> ... আবার কালই হয়তো আরম্ভ হয়ে যাবে— গ্যায়টে, শিলার, বেটোফেনের নাম সম্বলিত জার্মানীতে যাওয়ার যুক্তি তয়েরের কাজ। কিছু বিশ্বাস নেই মনকে।

লেখকের মনে জার্মানী সম্বন্ধে যে ঘৃণা ছিল উধাও হয়েছে একইসঙ্গে অ্যানি জার্মান ও ইহুদি তাই। 'এক জার্মানীতে সে কখনও যেতে চায় না'— লেখকের এই মনোভাবে পরিবর্তন আসবে নিশ্চয়ই।

এই হল কাহিনির সার-অংশ নয় বিস্তার; কাহিনির মধ্যেকার পুরো গল্প। প্যারিসে লেখকের অবস্থিতি যেমন এগিয়েছে— গল্পও এগিয়েছে, আর লেখকের চোখের সামনে খুলে গেছে 'পারি'-র রূপ, রস, বৈচিত্র্য— একে একে, স্তরে স্তরে ভূর্জপত্রের বাকলের মতো। আর সেই বাকলে লেখকের অতৃপ্ত মন ব্যাপ্ত নিঃসংশয়। সর্বদা সব কিছুকেই যুক্তির নিগড়ে আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে ফেলার জন্য। লেখকের নিজের কথায়—

> রূপকথায় রাজার নফর সফরে যায়, ভ্রমণ কাহিনীতে যায় লেখক। ... তাই যারা বুদ্ধিমান, তারা ভ্রমণ কাহিনীও পড়ে না; তথাকথিত আন্তর্জাতিক মিশন থেকে ঘুরে আসা রাজার নফরের স্টেটমেন্টও পড়ে না। তারা কেনে টুরিস্ট গাইড। এদের চাইতেও যারা কড়াপাকের লোক, তারা কেনে কেবল রেলওয়ে টাইম টেবলের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। তারা বলে মিথ্যেটাকে মিথ্যের মতো করে লিখলে তাকে বলে উপন্যাস; আর মিথ্যেটাকে সত্যের মতো করে লিখলে হয় ভ্রমণ কাহিনী...

এই গল্প বলাটুকু *সত্যি ভ্রমণ কাহিনী* বইয়ের চার আনা। বাকি বারো আনা হল কেন প্যারিস 'আধুনিক সভ্যতার সত্যিকারের রাজধানী, অগ্রসরদের তপস্যাস্থল, অনুসারকদের তীর্থ'— তারই বিশ্লেষণ। যুক্তি, তথ্য আর কার্যকারণের ঘনঘটায় ঢাকা পড়েছে অনুভব। 'পড়তে নয়, স্বাস্থ্যের জন্য নয়, সে এসেছে গাঁটের পয়সা খরচ করে মনের প্রসার বাড়াতে। কেবল অভিজ্ঞতার পুঁজি কিছু বাড়িয়ে নিয়ে দেশে ফিরলে কি তার চলবে?' ঘরকুনো মন ভালোবাসে বেরোনোর আগেকার নতুন দেশের স্বপ্নগুলো, আর ফিরবার পর বেড়ানোর সময়ের স্মৃতিগুলো। এইগুলোই আসল, বেড়ানোটা অবান্তর। আর তাই কাহিনিতে অ্যানি আসে সমাজের অতি সাধারণ স্তর থেকে।

> হোটেলের মেডকে ভালো লাগতে পারবে না— ভালো লাগালাগির আবার নিয়মকানুন আছে নাকি। তা কি হবার জো আছে পণ্ডিতদের জ্বালায়! কোনটা ভালোলাগা উচিত তারই শাস্ত্র লিখবার জন্য চিন্তাবাগীশরা কলম বাগিয়ে বসে আছেন। croce-এর মতো পণ্ডিত, ম্যাথু আর্নল্ডের মতো কবি এই নতুন দাসত্বের বিধিবিধানের খোঁজে তাদের বহুমূল্য সময় অযথা নষ্ট করেছেন।

প্যারিসে ভ্রমণের কথা বলা, প্যারিসের মানুষের অভ্যাসের কথা বলা, অ্যানির কথা বলা— এগুলো বলতে গিয়ে পাছে লেখকের ভাবপ্রবণতা বা উচ্ছ্বাস পাঠকের কাছে ধরা পড়ে, তাই যুক্তি দিয়ে টিপ্পনী দিয়ে বেঁধে ফেলার চেষ্টা 'কেন এই মনে পরিবর্তন আসছিল কিছুদিন থেকে, নিজের অজ্ঞাতে।'

সত্যি ভ্রমণ কাহিনী অবশ্যই অন্যরকম ভ্রমণ কাহিনি। ভ্রমণ কাহিনি বলা হবে নাকি উপন্যাস, তা নিয়ে আলোচনা, বিতর্ক হতে পারে বিস্তর। সাধারণভাবে ভ্রমণ কাহিনিতে প্রতিভাত হয় কোনো স্থানের সামাজিক রীতিনীতি, চিন্তা ও অভ্যাসের বৈচিত্র্য। পাঠক অন্য স্থানের মানুষ ও তাদের সংস্কৃতি জানবার ও বুঝবার উপায় খুঁজে পান। পাঠক সেই স্থানে ভ্রমণের পরিকল্পনা করতে পারেন, সহজেই; ও সেটা এমনভাবে করতে পারবেন যে ওই স্থানে ভ্রমণে গিয়ে মস্ত কোনো ভুল না হয়ে যায়। তবে সতীনাথ ভাদুড়ীর *সত্যি ভ্রমণ কাহিনী* বইতে ভ্রমণ পরিকল্পনা নেই, গুরুত্বপূর্ণ দ্রষ্টব্যগুলির চিত্রানুষঙ্গ বর্ণনা নেই; কীভাবে ও কী উপায়ে স্থানগুলি ভ্রমণ করা যায়, তারও কোনো বর্ণনা নেই। তাহলে এ লেখা ভ্রমণ কাহিনি হল কিসে? লেখকের 'Personal Narrative'-এ ফ্রান্স ও ইউরোপের অন্য অনেকগুলি দেশের মানুষের ও তাদের সভ্যতার খুঁটিনাটি এবং সাধারণ জনজীবনের যে ছবি চিত্রায়িত হয়েছে বিষদভাবে (পুরো বইটির বেশির ভাগটাই)— এই যে লেখার গড়ন তা কিন্তু একটি পরিচ্ছন্ন ভ্রমণ কাহিনিরই উদাহরণ। উৎসাহী পাঠক মাত্রেই মিল খুঁজে পাবেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *রাশিয়ার চিঠি* কিংবা অন্নদাশঙ্কর রায়-এর *পথে প্রবাসে* (১৯৩১) ইত্যাদি বইগুলির সঙ্গে। আবার বেশ একটা গল্পের অবতারণা আছে, শুরু থেকে শেষ আছে, শেষের পরের শুরু নিয়ে ইঙ্গিত আছে স্পষ্ট, আছে প্রত্যয়— উপন্যাস-এর মতোই। কাহিনি, প্লট,

গল্পের সঙ্গে গ্রন্থটির বিরোধিতাও লেখকেরই ভাষ্যে 'স্রোতের উৎসমুখ আসছিল বন্ধ হয়ে প্রশ্নের শৈবালে'। 'ভ্রমণ কাহিনী বললেই বুঝতে হবে যে, খানিকটা সত্যের ভেজাল নিশ্চয়ই মেশানো আছে লেখাটার মধ্যে।' তাই অ্যানির সঙ্গে সংশয় আছেই। বরঞ্চ সতীনাথের লেখনীতে প্রেম এসেছে উৎসারিত আলোর মতো, একমাত্র এই কাহিনিতেই। তাই আশা ও আকাঙ্ক্ষার খানিকটা বেসুরোপনা খারাপ লাগে না।

ব্যক্তি সতীনাথের রাজনৈতিক চেতনা ও সমাজতন্ত্র এবং সামাজিক সাম্যের প্রতি অনুরাগ এই ভ্রমণ কাহিনিতে সুস্পষ্ট।

> মাঝে মধ্যে সে বেড়িয়ে আসে প্যারিসের বাইরে। গ্রামাঞ্চলেই যায় বেশি। সে চায় সাধারণ মানুষকে জানতে। দেশের নামজাদা লোকদের সঙ্গে দেখা করবার স্পৃহা তার নেই। ফরাসীদের কথা ভাবতে গেলেই, কেবলই মনে পড়ে একরাশ দার্শনিক, সাহিত্যিক, শিল্পী আর গণনায়কের নাম। কিন্তু যুগ যুগ ধরে যে লক্ষ লক্ষ ফরাসী নিজেদের নাম মুছে দিয়ে, এই বড়ো কয়েকজনের নাম বড়ো হরফে লিখবার জায়গা করে দিয়েছে, সে বুঝতে চায় তাদের। ... সাধারণ হওয়াটাই মানুষের চরম বিকাশ; অসাধারণত্ব তারই একটা নাকলম্বা কার্টুন। আসল মনটা মরে যাবার পর যেটা থাকে, তাকেই মুখস্থ বুলিতে বলে চিন্তাশীল মন। মরা ব্যাঙের ঠ্যাংও বাইরের বিজলিতে নেচে সকলকে তাক লাগায়।

দীর্ঘকালের জাতীয় কংগ্রেসি সতীনাথ একাধিকবার কারাবরণ, উচ্চপদে সাংগঠনিক নেতৃত্বদান সত্ত্বেও ১৯৪৮-এ কংগ্রেসের সংস্রব ত্যাগ করে সোশ্যালিস্ট পার্টিতে যোগদান করেন। লেখকের মতে—

> সারা পৃথিবীর সংস্কৃতির নেতৃত্ব দেওয়া ফ্রান্স ঈর্ষাপরায়ণ। ফরাসী বিপ্লবের পর থেকে এরা চারটে রিপাবলিক, আর তিনবার রাজা বদলান দেখেছে। গভর্নমেন্টের ওপর এদের বিশ্বাস থাকে কি করে?... কিন্তু ঈর্ষার প্রকৃতি একটু অভিনব। মানসিক কৃষ্টির নেতৃত্ব ফরাসীদের, এইটা স্বীকার করলে আর সে দেশের সঙ্গে মন কষাকষি নেই।

সে দেশের সবচেয়ে বড়ো গালাগালি 'ফ্যাসিস্ট'— এ আসলেই তার নিজের রাজনৈতিক চেতনা। তাই ফ্রান্স সম্পর্কে তিনি একপেশে আবেগপ্রবণ।

> আমাদেরই দশা ফ্রান্সের। ভবিষ্যতের চেয়ে অতীতের দিকে বেশি চেয়ে থাকে ...হৃত মর্যাদা নিয়ে অনুশোচনার শেষ নেই। ... আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে তার ওজনটা আজ ধার করা; আজকের দেশের প্রাচুর্য ভিক্ষালব্ধ। সে মনে মনে বোঝে যে আজকের বাস্তব জগতে ফ্রান্সের গুরুত্ব সংস্কৃতির জন্য নয়। তার দাম, সে 'ইউরোপের সিংহদ্বার' বলে, আর তার আফ্রিকা ও সুদূর প্রাচ্যের কলোনিগুলো পরের বিশ্বযুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ স্থান হতে পারে বলে। ...সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পরাজয়ের ব্যর্থতার মধ্যে ফ্রান্স শান্তি খুঁজছে একটা ফিকে বিশ্বমানবতার আবরণে। নইলে মানবতার বুলি আর উপনিবেশের মাহাত্ম্য বর্ণন এ দুটো কি এক নিশ্বাসে বলা চলে?

ফ্রান্স সম্বন্ধে লেখকের মত ক্রমেই পরিবর্তিত হচ্ছে— যত বেশি দিন তিনি ফ্রান্সে থাকছেন ও ইউরোপের অন্য অন্য দেশ ও তাদের কৃষ্টি-সংস্কৃতির তুলনামূলক বিশ্লেষণ করছেন। 'যে মন চুলচেরা বিশ্লেষণ করে তার শেষ পর্যন্ত দরকার হয় কতগুলো গালভরা কথার ঠেকনার।' এমনকী জার্মান সম্বন্ধে তাঁর তীব্র বিদ্বেষের বরফ সাত মাস পরে বিগলিত হবার মুখে— সে কি শুধু অ্যানি জার্মান এবং ইহুদি, আর জার্মান সম্বন্ধে বিদ্বেষহীন তাই; না কি কিছুকালের স্বৈরাচারী শাসনের দর্পণে একটা জাতির সম্বন্ধে সম্যক ধারণা নেওয়া অযৌক্তিক, তাই। তন্দ্রাহীনা, লজ্জাহীনা 'পারি'-র হই হই করে চেঁচিয়ে গল্প করা, হুম করে কফিতে চুমুক মারা, মাছের কাঁটা আর ফলের বীচি যেমন করে ইচ্ছে মুখের থেকে বাইরে ফেলা, কাঁটা-চামচ দিয়ে খাওয়ার সময় প্লেটের আওয়াজ না শোনা, হো হো করে হাসা, প্রাণখুলে ফুটপাথ-এর উপর নাক ঝাড়া, বেপরোয়াভাবে ঢেকুর তোলা, মুখ চোখ নেড়ে কথা বলা, চৌরাস্তার মোড়ে ট্রাফিক আটকিয়ে প্রেয়সীকে চুমো খাওয়া, শনিবারের শেষ রাতে মদ্যপান করে চিৎকার করে গান গাইতে গাইতে বাড়ি ফেরা, মায়, মা লক্ষ্মীদের স্বাস্থ্য কিছুই নজর এড়ায় না লেখকের। 'ফরাসীরা কিন্তু আমাদের চেনা মানুষ। স্বাভাবিক বলেই তারা এত সুন্দর।' এই সৌন্দর্যের অনুভূতি লেখকের জীবনে সত্যি, সেটা প্রমাণ করতেই, কাহিনিতে লেখকের প্রেয়সী সমাজের কোনো উচ্চবর্গীয় বা শিল্পী, সাহিত্যের সমঝদার কেউ নন, বরং সমাজের নিম্নবর্গ থেকে উঠে আসা সাধারণ মজুর শ্রেণির একজন মহিলা, কায়িক পরিশ্রমের মাশুল গুনতে গিয়ে যার পনেরো দিনে মোজা ছেঁড়ে হাঁটুর কাছে, অথবা যার হাতের তালু শক্ত আর পায়ের গোছা মোটা; আর রাশভারী। যেকোনো প্রসঙ্গে যে বলতে পারে— 'আমি কি রাজনীতি?' সাদা চামড়ার মানুষ হয়েও যে বলবে, 'আমি কি টুপি পরি যে আমায় মাদাম বলে ডাকতে হবে?' প্রকৃতপক্ষে দীর্ঘ অবস্থানের পর ফরাসি সমাজের মহিলাদের স্থান বিপ্রতীপরূপে প্রতীয়মান। 'সাহিত্যিক Montaigne স্ত্রী-মনের বিশেষতা সম্বন্ধে একটা কথা সৃষ্টি করেছিলেন— Pesprit Primesautier অর্থাৎ, মেয়েমানুষ যতটুকু বোঝে, শোনামাত্র দেখামাত্র বোঝে।' আবার (Chambord)-এর প্রথম ফ্রান্সি-এর তৈরি প্রাসাদের এক জানলায়, তাঁর নিজের লেখা দুই লাইনের একটি সুন্দর কবিতা আছে—

> মেয়েমানুষের কথার ঠিকঠিকানা নেই,
> কেবল পাগলে তাদের কথা বিশ্বাস করে।

আবার, এই দেশেই লেখক দেখেন 'মেয়েদের ফাঁসি দিতে জজ সাহেব ইতস্তত করেন...' 'ছেলেপিলে নিয়ে বেড়াতে বেরুবার সময় ফ্রান্সে বাপে পেরাম্বুলেটর ঠেলে, মায়ে নয়।'... 'প্রতি ট্যুরের সময় টেবিলের সদ্যপরিচিতা ভদ্রমহিলাই মেনু বাছবেন, মদ পছন্দ করবেন, ম্যাকারনির ডিশ এলে পনীরের গুঁড়োর পাত্রটা তার উপর উজাড় করে ঢেলে নেবেন,

পুরুষদের জন্য কিছু অবশিষ্ট না রেখে; কিন্তু তাঁর মদের বিলটা পুরুষদেরই দিতে হবে।' এমনই নানান বৈপরীত্য থেকে ছুটি মিলেছে অ্যানিকে জার্মানে জন্মানো ইহুদি হিসেবে দেখার মধ্যে দিয়ে। তখনকার দিনে ইউরোপের বিভিন্ন দেশের অল্প শিক্ষিত, উচ্চ শিক্ষিত মানুষেরা অনেকেই ভাগ্য অন্বেষণে বা চাকরি করতে আসতেন প্রাচ্যে। সত্যিই অ্যানির বাবা 'কালকুত্তা' বা 'সাংহাই' কোথাও হারিয়ে গিয়েছিল। তাই, সে দেশ থেকে আসা লেখক ছিল অ্যানির কাছে অন্যরকম। হয়তো সত্যিই 'কালকুত্তা'-র মানুষের কাছে অ্যানি প্রেয়সী হিসেবে ধরা দিয়েছিল। হয়তো বা! যদি সত্যি হয় সতীনাথের জীবনে অ্যানির উপস্থিতির কাহিনি, যদি একটুও সত্যি হয়; তবে সতীনাথের অন্য লেখা যারা পড়েছেন, যারা গুণগ্রাহী, তারা অ্যানির মতোই 'ও লালা!' বলে লাফিয়ে উঠবেন বা এক পা মেঝের উপর ঠুকে একপাক ঘুরে নেবেন 'সত্যি ভ্রমণ কাহিনী'-র অন্দরে।

পুনশ্চ : বই আলোচনা করতে গিয়ে প্রায় পুরো গল্পটা বলার কারণ *সত্যি ভ্রমণ কাহিনী* আজকের দিনে অন্তত বহুপাঠ্য নয়, যেহেতু অনেকদিন মাঝে মুদ্রিত হয়নি। তাদের কেউ যদি এই লেখা পড়েন, ন্যূনতম আগ্রহ যাতে পান, সেই জন্য। আর এই লেখার পনেরো আনা বাক্য বা শব্দ বইটি থেকেই উদ্ধৃত করা। তাতে যা লিখতে চাওয়া হয়েছে তা নিয়ে আপোশ করা হয়নি মোটেই। এর কারণ সতীনাথ ভাদুড়ীর বই নিয়ে আলোচনা করার জন্য আমার মতো সাধারণ পাঠকের ওটাই সহজতম পথ মনে হয়েছে। তবুও কোনো বিকৃতি যদি কেউ খুঁজে পান, জানবেন এ নেহাতই অজ্ঞানের ভ্রান্তি, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত নয়।